ধর্মের রোষানলে বিবর্তন

(বন্যা আহমেদের বিবর্তনের পথ ধরে বইটির রিভিউ এবং বিবর্তনের বিরুদ্ধে ধর্মের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কিছু কথা)

-বিপ্লব

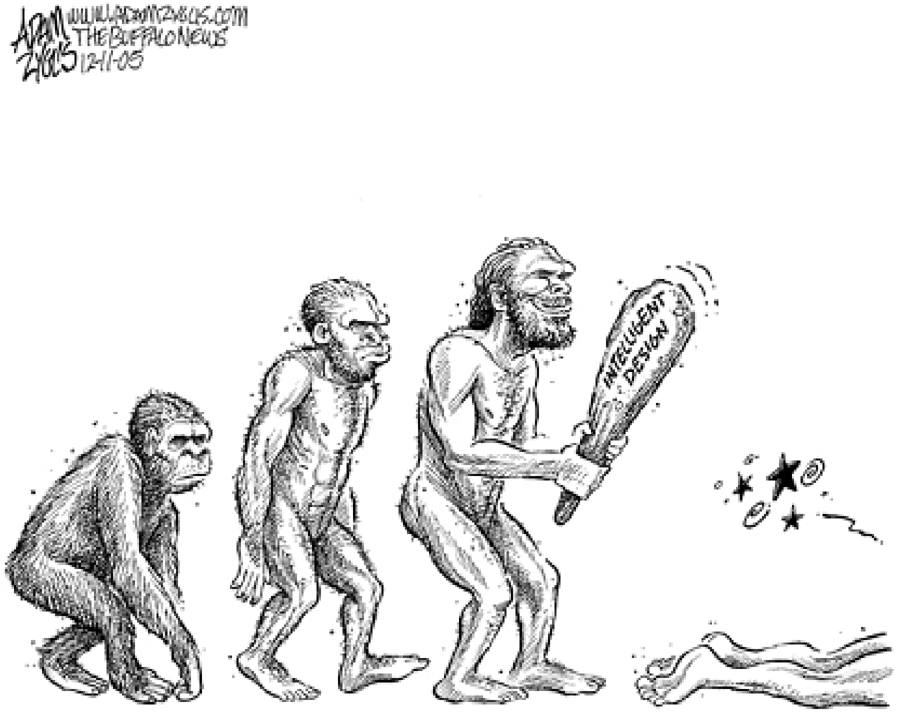

গ্রামের নাম বদ্যিপুর। ওই নামে দুই বাংলায় বোধহয় শতাধিক গ্রাম আছে এবং ধরুন অনেক গ্রামেই আছে শতাব্দি প্রাচীন নামিদামী হাইস্কুল। হঠাৎ শুনলেন, সেখানে মোল্লারা বা বিশ্বহিন্দুপরিষদের গুন্ডারা শিক্ষকদের শাসিয়েছে জীববিজ্ঞান থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ না তুলে দিলে, তাদের চাকরী এবং জীবন উভয়ই বিপন্ন হতে পারে! ডারউইনিজমের না পড়িয়ে সেখানে ঈশ্বর সৃষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় তত্ত্ব গেলাতে হবে! মানে একই ক্লাশের রাম জানবে মানুষের উৎপত্তি মনুর দেহ থেকে, আর রহিম জানবে আদম থেকে! অবস্থা যদি এতটা নীচে নাও নামে, ধর্মীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত বিজ্ঞানী নামের কিছু কলঙ্ক দাবী করে বসতে পারে ডারউইনিজমে ফুলচন্দন ছেটাতে হবে-মানে ছাত্রদের জানা প্রয়োজন ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য নির্দেশেই চলে প্রাকৃতিক নির্বাচন-তাই বিবর্তন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ বিবর্তনের প্রতিটা ধাপ। যেন ঈশ্বরের সৃষ্ট সপ্তম সোনাটার সুরে বাজছে মানব ডি এন এর ছন্দ। হাজার হলেও এত বৈজ্ঞানিক প্রমান ! অস্বীকার করলে লোকে ব্যকডেটেড মোল্লা বলবে না? তাই মর্ডান মোল্লাদের মতন বরং বলা হোক বিবর্তনের মাধ্যমেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর! ব্যাস ঈশ্বর এবং ডারউইন সাহেব একসাথে সুখে বসবাস করুক! শুধু ডারউইন শেখালে আপনার ছেলে মেয়েরা কিন্তু খুব খুব খারাপ টাইপের হবে! কারণ তারা যদি ডারউইন পড়ে জানে তাদের সৃষ্টি স্বতষ্ফূর্ত এবং তার পেছনে কোন উদ্দেশ্য নেই-তারা যা খুশী করে বেড়াবে! এতেব বন্ধুগন ডারউইনের তত্ত্ব সুকোমল ছাত্রছাত্রীদের

শেখালে জাহান্নামের জন্নত তাদের ভবিষ্যত! এরজন্যে বিজ্ঞানকে বিকৃত করতে হবে-এটা ধার্মিকদের দাবী!

অনেকেই বলবেন ভারত বা বাংলাদেশের পরিপেক্ষিতে বিবর্তনের রাজনৈতিক গুরুত্ব কি? সেখানেতো ক্রিয়েশনিষ্টদের ভূত নেই! আমরতো বাপু সবাই ডারউইন পড়েছি বেশ নির্বিঘ্নে! ভারতে বামপন্থী শাসিত রাজ্যগুলিতে এরা পাত্তা না পেলেও, বিজেপি শাসিত রাজ্যে স্কুলের সিলেবাসে এমন অপবিজ্ঞান ভবিষ্যতে ঢুকবে না-এমনটা বলা মুস্কিল। বাংলাদেশ ধর্মনিরেপেক্ষ দেশ না হওয়ায়, ক্রিয়েশনিষ্টদের ভাষায় আল্লাকে স্বীকার করে বিবর্তন পড়ানোর দাবী ওঠা সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

আমি বন্যা আহমেদের *'বিবর্তনের পথ ধরে'* বইটার রিভিউ লিখতে গিয়ে এমন এক গুরুগম্ভীর ভবিষ্যতবাণী দিয়ে শুরু করেছিলাম। পরের দিন সকালে উঠে দেখি মুক্তমোনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আখতারুজ্জামান লিখেছেন মোল্লাদের ফতেয়াতে বাংলাদেশে স্কুলের সিলেবাস থেকে বিবর্তন অলরেডী আউট!

আমার কল্পনার চেয়ে বাস্তব আরো রূঢ়!

না ঈশ্বরভিত্তিক বিবর্তনেরও সেখানে স্থান হয় নাই-বিবর্তনের বক্তব্য কোরান বিরোধি, তাই একদম মাঠের বাইরে! আমিতো অবাক! শুধু অবাক নই-রাগও হলো প্রচন্ড। বাংলাদেশ আমার দেশ না বটে-কিন্তু বিজ্ঞানকে হিমঘরে পাঠিয়ে, ভবিষ্যত প্রজন্মকে কি বিভৎস রকমের পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে সেই চিন্তায় আঁতকে উঠলাম। একটা দেশের মেরুদন্ড হচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষা। ধর্মের হাজার প্রচারের বিরুদ্ধে দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখে স্কুলের ধর্মনিরেপেক্ষ শিক্ষা। শিবরাত্রের সলতে। সেখানেও হাত! শিক্ষিত শ্রেনীর মধ্যে যারা বি এন পির সার্পোটার, তারা এক বারো কি ভেবে দেখেছেন, বিজ্ঞান চেতনা এবং শিক্ষাকে কি ভাবে ইসলামের হাতে ধ্বংশ করা হচ্ছে? একটা গোটা প্রজন্মকে ধর্মান্ধ বানানো কি ধরনের জাতীয়তাবাদ? এরপরেও কি কেও অস্বীকার করতে পারে বি এন পি জাতীয়তাবাদের মোরকে দেশটাকে মধ্যযুগীয় আরব সংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে? না কি ধরে নেবো বি এন পির মধ্যে বিজ্ঞান মনস্ক লোক নেই-যারা আছে তাদের কাছে দেশপ্রেমের সংজ্ঞা হচ্ছে বিজ্ঞান চেতনাকে হত্যা করে ইসলামের প্রচার? দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম উচ্ছন্নে গেলে যাক! জাতীয়তাবাদ মানে দেশের সার্বিক উন্নতির জন্যে রাজনীতি এবং ত্যাগ স্বীকার। এই ভাবে কিছু ধর্মোন্মাদ তালিবান বানিয়ে বাংলাদেশের কি উন্নতি হবে?

দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে, বিবর্তন জীববিজ্ঞানের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-এবং এটা জীববিজ্ঞানের সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া মানে দেশটার ইসলামীকরনের আর কিছুই বাকি নেই। আমি অধ্যাপক আখতারিজ্জামানের ভাষাই তুলে দিচ্ছিঃ

ধ্যানধারণার। জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠা করার একটি সচেতন ও সংগঠিত প্রচেষ্টা চলছে এসব স্থানকে কেন্দ্র করে। তাই বলা যায় এগুলো হয়ে পড়ছে মধ্যযুগীয় মুর্খতা প্রচার কেন্দ্র। এর ঢেউ এসে লাগছে আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও। এ পরিমন্ডলেই কয়েক বছর আগে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জীববিজ্ঞানের পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ পড়েছে বিবর্তন তত্ত্ব। অথচ সেই ব্রিটিশ আমল থেকে উক্ত স্তরের পাঠ্য পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টির জন্য নির্দিষ্ট থাকত একটি অধ্যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী একটি ছাত্র সংগঠনের প্রকাশ্য চাপে পড়ে বিবর্তনবিদ্যা পড়ানো বন্ধ করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রথমে মাস্টার্স শ্রেণী থেকে বিবর্তনবিদ্যার কোর্স বাদ দিয়ে এবং পরে সম্মান শ্রেণীর সিলেবাস সঙ্কোচন করে বিষয়টির যথেষ্ট গুরুত্ব হ্রাস করা হয়েছে। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলোতে পড়ে দেশের সিংহভাগ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী। একাডেমিক জগতের বাইরেও নানাভাবে বিজ্ঞানবিমখ প্রচারণা বেশ শক্তিশালী

বাংলাদেশে বিজ্ঞানচেতনার এমন সংকটপূর্ণ দিনে বন্যা আহমেদের 'বিবর্তনের পথ ধরে' এক মহান গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। বাংলায় ডারউইনের বিবর্তনের ওপরে এমন 'স্টেট অব দি আর্ট' বই লেখা হয় নি। বইটি বহু পরিশ্রমের সযত্ন ফসল। এবং এতে ডারউইনের ঐতিহাসিক তথা বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপট যতটা গভীরে ব্যাখ্যা করা আছে-পাঠক ততটাই আমোদিত হবে বিবর্তনের ওপর অতি সাম্প্রতিক আবিষ্কার এবং তার তাৎপর্য্য নিয়ে। ফসিল, ডেটিং মেথড, জেনেটিক বিবর্তন এবং শেষে মানুষের উদ্ভবের ওপর সাংঘাতিক এক আকর্ষনীয় চ্যাপ্টার। হোমোসেপিয়েন্সের উদ্ভব, ওয়াই জিন নৃতত্ববিদ্যা ইত্যাদি আধুনিক মেথড থেকে (যা আমরা শুধু ডিসকভারি চ্যানেলেই দেখতে অভ্যস্ত) টানা মানুষের সাম্প্রতিক ইতিহাসের নিত্যনতুন আবিষ্কার বাংলা ভাষায় প্রথম এলো বন্যা আহমেদের লেখনী ধরে। পাশাপাশি বিবর্তনকে আটকানোর জন্য চার্চের অপপ্রয়াসের ইতিহাস বইটিতে আকর্ষনীয় ভাবে লিপিবদ্ধ। বিবর্তন নিয়ে আগেও অনেক বই বাংলায় লেখা হয়েছে। কিন্তু জীববিজ্ঞান, জেনেটিক্স, ভূবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ধর্মের রাজনীতির আকর্ষনীয় মেলবন্ধন এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরন কেবল মাত্র এই বইটিতেই পাওয়া যাবে। তাছারা প্রতিটি অধ্যায়ে বিবর্তনের ওপর সদ্যপ্রকাশিত গবেষনালদ্ধ খবরগুলি বইটির আকর্ষন শতগুনে বর্ধন করেছে।

প্রথম অধ্যায়ে লেখিকা ব্যাখ্যা করেছেন বিবর্তনের দার্শনিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব। প্রজাতির উদ্ভবে ডারউইনের আবিষ্কার বৈপ্লবিক। কারণ ধর্মের ছহাজার বছরের স্থিতিশীল প্রাণীজগতের অচলায়তনের বিরুদ্ধে তা ছিল কঠোরতম আঘাত। আদম এবং ইভের রূপকথার অবসান-ভালো লাগুক বা গা গোলাক, বানর এবং শিম্পাঞ্জিদের আমাদের পূর্বপুরুষ বলে স্বীকার করা। বৃহত্তর অর্থে ধর্মের রূপকথাকে ছুঁড়ে ফেলে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা!

দ্বিতীয় অধ্যায় ভূতত্ত্ব এবং ফসিলের ওপর। বিজ্ঞান প্রমান নির্ভর-এবং বিবর্তনের আদি প্রমান স্মরণাতীত কালের ফসিলগুলি। ফসিলের উৎপত্তি, বিশ্লেষন এবং তা থেকে কি ভাবে বিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়,

তার সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যাবে এই অধ্যায়ে। ফসিলের রূপ পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে কিভাবে লুপ্ত প্রজাতির ইতিহাস উদ্ধার করা হয়, তা সাধারণ পাঠকদের জন্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এবং বিজ্ঞানের এই ইম্পিরিক্যাল পদ্ধতি সবারই জানা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায় পৃথিবী বয়স নির্নয় নিয়ে বিজ্ঞানের ইতিহাস। শুধু তৃতীয় অধ্যায় নিয়েই একটা পূর্ণাঙ্গা গ্রন্থন সম্ভব। লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি, জেমস হাটন, লায়েল, লর্ড কেলভিন থেকে লর্ড র‍্যাদারফোর্ডের রেডিও একটিভ ডেটিং এর মাধ্যমে আমরা জানলাম পৃথিবীর বয়স চারশো কোটি বছরেরও বেশী। এই সত্য উন্মচনে সময় লাগলো দুই শতাব্দি। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে যেটা উল্লেখযোগ্য -প্রথমের দিকের বিজ্ঞানীরা বয়স নির্ধারণে ভুল করলেও তা ধর্মের রূপকথা অনুযায়ী পৃথিবীর ছহাজার বছর বয়সের চেয়ে অনেক অনেক বেশী এবং তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন শীলাস্তর বা তাপগতিবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। বিজ্ঞানে সিদ্ধান্তর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্ঠা-বিশ্বাস বর্জন করে যুক্তি এবং প্রমানের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আরোহন।

চতুর্থ অধ্যায়টি পাঠকদের বিশেষ ভালো লাগবে- আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া বিবর্তনের চলচিত্র। বার্ডফ্লু ভাইরাসের দ্রুত বিবর্তন, ডি ডি টি দিয়ে মশা বিনাশের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা, ক্রমাগত কীটনাশক ব্যবহারে কীটনাশকরোধকারী পোকার উথান, ইত্যাদি কিছু চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে দিয়ে লেখিকা জানিয়েছেন বিবর্তন দেখার জন্য বিগিউলে করে ঘুরে ফসিল দেখার দরকার নেই-চোখের সামনেই অহরহ ঘটছে বিবর্তনের ঘটনা।

ফসিল মানব সভ্যতা দেখে আসছে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে। কিন্তু বিবর্তনের ধারণার জন্মের আগে সেই সব বড় বড় ফসিল জন্ম দিয়েছিল ড্রাগন, সর্পরাজ ইত্যাদি রূপকথা গুলির। যার প্রমান হিন্দু পুরান, গ্রীক মিথোলজী এবং আরব্য রজনীর উপাখ্যান। পঞ্চম অধ্যায় এইসব প্রাচীন উপাখ্যানের ওপর-যা অনেক ক্ষেত্রেই লোকায়েত ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ফসিলের মধ্যে প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে কোটি কোটি বছরের পুরানো প্রাণীরা। কি ভাবে দুই পাথরের ফাঁকে ধরা পড়ে এই সব ফসিল? আর তাদের সংখ্যাই বা এত কম কেন? লেখিকা আমাদের নিয়ে গেছেন ভূতত্ত্বের গভীরে-যেখান প্লেট টেক্টনিক্স, পলিসংকর্ষনের জন্য প্রকৃতির মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হয় অতীতের অয়বয়-এই নিয়েই ষষ্ঠ অধ্যায়। ফসিল নিয়ে যারা আরো গভীরে জানতে চাইছেন-তাদের কৌতুহল তৃষ্ণা মেটাবে এই ফসিল উপাখ্যান।

পৃথিবীর যখন চারশো পঞ্চাশকোটি বছরের যুবা-জানতে নিশ্চয় ইচ্ছা করে একশো, দুশো কোটি বছর আগে পৃথিবীতে কারা ছিল? কবেই বা হলো প্রাণের উদ্ভব? এইসব নিয়েই সপ্তম অধ্যায়- পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতিটা কল্পে-প্যালিওযোয়িক, মেসোযোয়িক এবং সিনোনেয়িক অধ্যায়ে কারা রাজত্ব করত পৃথিবীতে? তাদের রাজ্যপটের ধারাহাবিক বিবরণে আমরা দেখি তিনশো কোটি বছরের প্রবাহমান প্রাণের ইতিহাস।

বিবর্তনের বিরুদ্ধবাদিদের সবথেকে শক্তিশালী অস্ত্র মিসিং লিংক। অর্থাৎ ধরুন এই যে আমরা বলছি সরীসৃপ থেকে এসেছে আধুনিক পাখীরা-তাহলে মধ্যবর্ত্তী পর্যায়ে না পাখী, না সরীসৃপের ফসিল কোথায়?? গত দুই-তিন শতাব্দিতে আবিষ্কৃত অনেক নতুন ফসিল খুলে দিয়েছে বিবতর্ন নিয়ে নতুন

গবেষনার নয়া দিগন্ত-সাথে সাথে মিসিং লিংকগুলিও আস্তে আস্তে জোড়া লাগছে। অষ্টম অধ্যায় এই সব মিসিং লিংক গুলির খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা।

নবম অধ্যায় আমাদের মানুষ হয়ে ওঠার গল্প। গত দুবছরে আবিষ্কৃত নানান নতুন ফসিল এবং জিন-তথ্যবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতিতে হোমিনয়ডা বা বানর মানুষ থেকে গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের সমান্তরাল বিবতর্নের কাহিনী। গত একদশক আগেও আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ নিয়ে যা জানতাম, তা এখন বাতিল। এবং নতুন নতুন ফসিলের ওপর ভিত্তি করে এটা ক্রমশ প্রকাশ্য অস্ট্রেলাফিতেনাস আফ্রিকানো বা আফ্রিকার আদিম বানর মানুষ থেকে মানুষ সরলরেখায় বিবর্তিত হয় নি, মধ্যে মধ্যে এসেছে অনেক সমান্তরাল উপজাতি-যেমন হোমো হাবিলিস, হোমো রুডলফেনিস ইত্যাদি। মোদ্দা কথা আগামী কয়েক বছরে আরো আবিষ্কারের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা-মানুষের শেষ ধাপের বিবর্তনকে সম্পূর্ণ রূপে জানতে। এই অধ্যায় প্রায় চ ল্লিশ পাতার এবং গত দশকে মানুষের উদ্ভবের ওপর চমকপ্রদ নতুন আবিষ্কারের সারপঞ্জি যা বাংলা ভাষায় প্রথম লেখা হল।

দশম অধ্যায়-ইন্টালিজেন্ট ডিজাইনের ওপর। আমাদের অনেকেই আমেরিকায় গত দুবছরে সৃষ্টিবাদি খ্রীষ্টানদের তান্ডবলীলার সাথে পরিচিত নন। এদের বলে ক্রিয়েশনিষ্ট বা সৃষ্টিবাদি-বক্তব্য ডারউইনের তত্ত্বকে না ঠেকালে ধর্ম-নৈতিকতা তথা ঈশ্বর রসাতলে। তা ঈশ্বরকে বাঁচাতে এরা যা শুরু করেছেন তা বিজ্ঞান তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে সত্যিই অভুতপূর্ব। যদিও ক্রিয়েশনিষ্টদের পেছনে ডিসকভারী ইনস্টিটিউট, সি আর সির সহ অসংখ্য ছদ্মনামী খ্রীষ্টান সংস্থা এবং সমস্ত চার্চ, ঈশ্বরকে বাঁচাতে এরা যে পরিনাম অসৎ কাজকর্মের সাথে যুক্ত, তাতে যারা সৎ ইত্যাদি মানবিক গুনের জন্য ধর্মের সওয়াল করেন, তারা লজ্জায় নাস্তিকদের দলে যোগ দিতে পারেন। সবথেকে   হাস্যকর ব্যাপারটা হচ্ছে ক্রিয়েশনিষ্ট খ্রীষ্টানরা দাবি করে, নৈতিকতার প্রতিষ্ঠার জন্যই বস্তুবাদি ডারউইনিজম না পড়িয়ে ঈশ্বরবাদি ডারউইনিজম পড়াতে হবে! তা এদের নিজেদের চুরি এবং অসততার লিষ্টটা প্রতিদিন এত লম্বা হচ্ছে, প্রাক্তন কিছু ক্রিয়েশনিষ্ট, যার নৈতিকতার প্রতিষ্ঠার জন্যেই একদা এদের সহযাত্রী ছিলেন, তারাই ফাঁস করে দিচ্ছেন এই ক্রাইম সিন্ডিকেটের অপরাধ, চুরি এবং অসততার সাতকাহন।

- এরা প্রতিটা চার্চ, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গানে ক্রিয়শনিজমের পক্ষে সভা ডাকছেন। উদ্দেশ্য একটাই-ভুলভাল, মিথ্যে তথ্য দিয়ে প্রমান করার চেষ্টা ডারউইনিজম বৈজ্ঞানিক ধাপ্পাবাজি!এবং এর প্রয়োজনে এরা ফসিলের মর্ফড ছবি, বৈজ্ঞানিক পেপারের ভুল কোটেশন, বিজ্ঞানীর ভুল কোটেশন, সৃস্টিতত্ত্বের পক্ষে থাকা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রাণীবিজ্ঞানী বানানো, ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্য ইত্যাদি নানা টেকনিকের সাহায্য নিচ্ছেন। প্রতিটা চুরিই হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ডারউইনের বিরুদ্ধে ৫০০ জন বিজ্ঞানীর একটা সনদ নামা খাড়া করেছে এরা-যাদের অধিকাংশই কোন জীববিজ্ঞানীই নয়। এদের মধ্যে যারা জীববিজ্ঞানী আছেন-তাদের অনেকেই নৈতিকতার প্রশ্নে এদের সহমর্মী। কিন্তু ডারউইন ভুল বা বিবর্তন র‍্যান্ডম নয়, এমনটা কোন জীববিজ্ঞানী বা জীববিজ্ঞানের পেপার বলে নি।
- বিজ্ঞানের কোন জার্নালে এখনো কোন ক্রিয়েশনিষ্টদের পেপার ছাপা হয় নি এবং পৃথিবীর যাবতীয় বিজ্ঞানীকুল একে ধর্ম বলেই আখ্যা দিয়েছেন-একটু ঠোঁটকাটা বিজ্ঞানীরা বলেই দিয়েছেন এসব হাস্যকর যুক্তি এবং ভুয়ো তথ্য। আমেরিকার প্রতিটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা-ন্যাশান্যাল সায়েন্স ফাওউন্ডেশন , ন্যাশানাল একাডেমি অব সায়েন্স এবং ন্যাশানাল সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন সকলেই ক্রিয়েশনিজমকে অপবিজ্ঞান তথা ধর্মীয় প্রচার এবং বিবর্তনকে বৈজ্ঞানিক সত্য ও প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব বলে নানান মিডিয়ায় ঘোষনা করেছে। যাতে ক্রিয়েশনিষ্টদের প্রচারে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হয়। তাতে কি? চার্চে প্রতি রবিবার ডারউইনের বিরুদ্ধে সভা এবং শিক্ষাদান অব্যাহত!
- এদের ক্রিমিন্যাল নেটওয়ার্ক এত বিস্তৃত-যেখানে স্কুলের জীববিজ্ঞানের বই ছাপা হচ্ছে সেখানে

পাবলিশিং ইন্ডাষ্ট্রির মধ্যে ঢুকে থাকা এদের নন্দী ভৃঙ্গীরা বিবর্তনের অধ্যায়ের মধ্যে ডারউইন বিরোধী ওয়েব সাইট ঢুকিয়ে দিচ্ছে। জীববিজ্ঞানের অনেক লেখক এর তীব্র প্রতিবাদ করে, অপরাধীদের জেলে পাঠানো তথা আর্থিক ক্ষতিপূরনের কথাও ভাবছেন।

- জীববিজ্ঞানের শিক্ষকদের পারিবারিক চাপ দেওয়া হচ্ছে বিবর্তন না পড়ানোর জন্য। ধরুন কোন শিক্ষকের স্ত্রী চার্চের সাথে যুক্ত-এরা স্ত্রীকে কাজে লাগাচ্ছেন স্বামীকে চাপ দিতে। কম্যুনিটি স্কুলগুলোতে চার্চের প্রভাব খাটানো হচ্ছে ডারউইনিজম না পড়ানোর জন্য। কিছুদিন আগে চাপটা ছিল বিবর্তন না পড়িয়ে ক্রিয়েশনিজম পড়ানোর জন্য-ডোভার স্কুল ডিস্ট্রিক্ট চার্চের চাপে সৃষ্টিবাদ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করে এবং পরবর্ত্তীতে এক মিলিয়ান ডলার ফাইন দিতে বাধ্য হয় (২০০৫)। ফলে ক্রিয়েশনিজম স্কুলে পড়ানোর ঝুঁকি আর কেও নিচ্ছে না-কিন্তু জীববিজ্ঞানের শিক্ষকদের বেসরকারী ভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে-যাতে তারা বিবর্তনবাদ ক্রিয়েশনিষ্টদের ভাষায় পড়াতে বাধ্য হন। অনেকটা অশ্বথামা হত ইতি গজ স্টাইলে ডারউইন পড়ানো-ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন বিবর্তনের মাধ্যমে!
- এবং ইন্টারনেটে তথ্য দুষন! বেশ কয়েকশো সাইট তৈরী করেছেন ক্রিয়েশনিষ্ট অনুগামীরা। কাজ একটাই-হয় ডারউইনের তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানানো বা তথ্যবিজ্ঞান ইত্যাদির সাহায্যে কিছু ভুলভাল অপবিজ্ঞান সৃষ্টি করে প্রমান করা বিবর্তনের পেছনে রয়েছে ঈশ্বরের হাত! সাধারণ মানুষের বৈজ্ঞানিক অজ্ঞতাকে হাতিয়ার করে গড়ে উঠছে ক্রিয়েশনিষ্টদের কল্পবিজ্ঞান।

গতবছর কৃষ্টাল ক্যাথিড্রালে (এটা বিশ্ববিখ্যাত চার্চ-যা ক্রীস্টাল মানে কোর্য়ার্জের তৈরী-আলোর প্রতিফলনে এর স্থাপত্য অপরূপ) ক্রিয়েশনিজমের ওপর একটা ব্যালে শো দেখতে গিয়েছিলাম। এদের তিনশোফুটের বিস্ময়কর স্টেজে বিগব্যাংগ থেকে ডারউইনের বিবর্তন সবই দেখালো-শুধু পাশাপাশি জানিয়ে রাখলো জেনেসিসের প্রতিটা দিন আসলে কল্প! এবং বিবর্তনের প্রতিটা ধাপ ঈশ্বর চাইলেন বলে সৃষ্টি হল! ভাবের ঘরে এই চুরি, প্রায় অসহ্য পর্যায়ে নেমে এসেছে আমেরিকায়।

ক্রিয়েশনিষ্ট আন্দোলনের জনক ফিলিপ জনসনের এক উক্তি থেকে পরিষ্কার, আই ডির লড়াইটা ধর্মর সাথে বস্তুবাদের সংঘাতঃ

"So, did God create us? Or did we create God? That's an issue that unites people across the theistic world. Even religious, God-believing Jewish people will say, "That's an issue we really have a stake in, so let's debate that question first. Let us settle that question first. There are plenty of other important questions on which we may not agree, and we'll have a wonderful time discussing those questions after we've settled the first one. We will approach those questions in a better spirit because we have worked together for this important common end." -- *Phillip Johnson*

ফিলিপের বক্তব্য বেশ ভয়াবহ। এবং তার আবেদনটা সমস্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসী লোকেদের কাছে সার্বজনীন-ঈশ্বর না মানুষ আগে! সৃষ্টি না স্রষ্টা? সমস্যা হচ্ছে আমাদের কাছে ঈশ্বর সৃষ্টি আর মানুষ তার স্রষ্টা-কিন্তু ধার্মিকদের কাছে আমরাই সৃষ্টি, উনিই স্রষ্টা! আমাদের দেশে গোঁড়া হিন্দুত্ব এবং ইসলামে যারা বিশ্বাস করে তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান হয় খুব কম বা বিভ্রান্তিকর- তাই এই ধরনের উৎপাত এখনো শুরু হয় নি। কিন্ত ইন্টারনেটে আভাস পাচ্ছি এই ধরনের অপবিজ্ঞানে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে, ঈশ্বরবাদি বিবর্তনের হয়ে বা খোদ বিবর্তনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি মাঠে নেমেছে কিছু শিক্ষিত বাঙালী ধর্মপ্রচারক।

আমি বাংলাভাষী প্রতিটা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করবো বইটা পড়ার জন্য। ভিন্নমত ওয়েবসাইটে ইলিংকে রইলো বইটা। পাশাপাশি বিজ্ঞান সচেতন প্রতিটা বাঙালীকে আমার আবেদন আপনারা বইটার প্রচার করুন বন্ধু এবং ছাত্র মহলে। এই বইটি পড়ে বিবর্তন নিয়ে যে সচেতনতা আসবে-তা আগামী দিনে সৃষ্টিবাদি ধর্মব্যবসায়ীদের এবং অপবিজ্ঞান প্রচারকদের বিরুদ্ধে হবে সবথেকে শক্তিশালী হাতিয়ার।

ক্যালিফোর্নিয়া ১২/১৫/০৬